Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501027 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Hungry Bengal: An Intimate Reading of Famine Poetry
ক্ষুধার্ত বাংলা: দুর্ভিক্ষের কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ

Bidyut Chowdhury
Assistant Teacher
Uttar Chandipur B.P. High School (Higher Secondary), Malda

Received on: 14th April 2026
Accepted on: 10th May 2026

Abstract:
Literature is the thought of the time. The famine of the fifties had a profound effect on contemporary writers. Their writings captured several valuable images of that time. The cries of the hungry people and strong protests against exploitation were heard in the poems of numerous poets that day. Leaving romanticism behind, the horror of reality prevailed. The beautiful full moon was called 'scorched bread'. The poems of the famine are proof of that.

Key Words:
The Second World War, the Famine of '50, contemporary poets.

মূল প্রবন্ধ

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন ইত্যাদি আধুনিক কবিদের ভাবনাকে অন্যপথে চালিত করেছিল। কবিমনের কল্পনা প্রবণতা বনাম কঠোর বাস্তবতা — এই দু'য়ের স্ফুরণ ঘটেছিল নতুন কাব্যরচনার মধ্যে দিয়ে। এই সময়কার কবিদের মধ্যে যাঁরা বাংলার দুর্ভিক্ষকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁদের অন্যতম কবি দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ।

যুগের হুজুগে কেবল অঙ্গভঙ্গির চমক, সস্তার নামবাসনার প্রলোভন দেখিয়ে যে সমস্ত গুটিকয় কবি পাঠকের মন জয় করেছিলেন, দিনেশ দাস শান্ত সমাহিত সেই স্বধর্মনিষ্ঠ কবিদের মধ্যেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কাব্যে অসংযত বা অতিরিক্ত আবেগ নেই, নেই কোনো আতিশয্য। চপল প্রেম, উচ্ছ্বসিত জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক প্রচার অথবা অপপ্রচার, দোলাচলতা, উপমার ভেল্কি ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁর প্রয়োজন হয়নি। দুর্ভিক্ষের উপর রচিত তাঁর কবিতাগুলি হলো 'বাংলা: ১৩৫০', 'ভুখ মিছিল', 'গ্লানি: ১৩৫০', 'নববর্ষের ভোজ', 'ডাস্টবিন', 'দোলনা' ইত্যাদি। কবিতাগুলি একত্রে ১৯৪২ সালে দিনেশ দাসের 'ভুখ মিছিল' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

'বাংলা: ১৩৫০' কবিতাটিতে গৃহহীন, খাদ্যহীন, বাসস্থানহীন ও সর্বোপরি জীবনীশক্তি রহিত সাধারণ মানুষের কষ্টের জীবন বর্ণিত হয়েছে। কলকাতার ফুটপাতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকে তিনি কয়েকটি নঞর্থক উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। 'দীর্ঘশ্বাস', 'চোখের জল', 'ব্যথার বাষ্প', 'কালো কুয়াশা', 'শিশির', 'বন্যার হাওয়া' — এগুলি ক্ষণস্থায়ী হলেও এদের কালো প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বাইশ লাইনের এই কবিতাটিতে কবি মূলত তিনটি ভাবকে তুলে ধরেছেন। কবি বলেছেন ক্ষুধার্ত মানুষের সমবেত প্রচেষ্টাকে বারে বারে ম্লান, অবনত হতে হয় ক্ষমতার শীর্ষে থাকা 'শাণিত সূর্যের ক্ষুরধার' আঘাতে।

© Santiniketan Sahityapath

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) মহাসমরে ভারত প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেনি ঠিকই তবুও যুদ্ধের করাল প্রভাব থেকে বাংলা-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীরা মুক্ত হতে পারে নি। দিনেশ দাসের 'ভুখ মিছিল' কবিতাটিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির মতে, বাংলার আকাশে বা মাটিতে কোথাও যুদ্ধ নেই, অন্তত সরাসরি অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি বা দামামার রণহুঙ্কার নেই। তবুও কবি অনুভব করেন —

"হাওয়ায় কিসের সুর
আহত আর মুমূর্ষুর
বিষণ্ণ।
অন্ন নেই পণ্য নেই বিপন্ন।"[১]

'গ্লানি: ১৩৫০' কবিতাটির 'আমি' আসলে সমাজের উঁচু স্তরের প্রতিভূ। অন্যের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসল অনায়াসে যার মুখে ওঠে। কবিতাটির নিখুঁত শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে আছে 'অন্নহীন, গৃহহীন, মৃত আর মুমূর্ষু মানুষের ভিড়। এদের অনেকেই একদিন ঘাম ঝরিয়ে মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলিয়েছিল। কিন্তু সেই পরিশ্রমের ফসল এখন অন্যজন ভোগ করছে। বিত্তবানদের মুখে ওঠে ক্ষুধার্তদের অন্ন। উঁচুস্তরের ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। তারা অন্যের 'ফ্যান দাও' চিৎকারে কর্ণপাত না করে রোজ দু'বেলা ভরা পেটে ঢেকুর তোলে। কবির প্রশ্ন, তাদের কি কোনো গ্লানি নেই? তারা কি বিবেকের দংশন অনুভব করে না? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার কারণে বাংলার খাদ্যসংকট — এই দু'য়ের প্রেক্ষিতে দিনেশ দাসের 'নববর্ষের ভোজ' কবিতাটি রচিত। অন্নসংকটের দিনে 'ভোজ' কথাটি নিঃসন্দেহে বিদ্রূপ (irony)। 'ভোজ' শব্দটি এখানে নঞর্থক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে 'ভোজ' খাদ্য জোগানের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করে, তা এখানে জীবন-সংহারকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। 'বোমার লাড্ডু', 'বারুদের রুটি' কথাগুলি আসলে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের প্রতি তিরস্কার। ইংরেজরা সাধারণ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা মহাপ্রভু। তারা আপামর জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করেছে, অনটন থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য খাদ্য-বস্ত্র রপ্তানি করে যাচ্ছে। কবি তাই বলেছেন যদি কোনো ইংরেজ সাধারণ বাঙালির ঘরের অতিথি হন তবে গৃহকর্তা যতই দরিদ্র হোক না কেন, রাশিকৃত 'বোমার লাড্ডু' এবং 'বারুদ-রুটি' সহকারে সে তার অতিথিকে অবশ্যই আপ্যায়ন করবে।

দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের ভাগ নিয়ে শহরের ডাস্টবিনগুলিতে মানুষ ও পশুর মধ্যে লড়াই চলত। কিন্তু এরপর এমন দিন এল যখন সেই ডাস্টবিনেও খাদ্য অমিল হলো। মুষ্টিমেয় কয়েকজন দেশি-বিদেশি বণিকের করায়ত্ত ক্ষমতার ফলে সাধারণ ভারতবাসীর দুর্দশার অন্ত ছিল না। কয়েকজনের 'ভব্যতা'র মাশুল দিতে গিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল। জনাকয়েক অর্থ পিপাসুর অট্টহাসির আড়ালে কয়েক লক্ষ মানুষের অশ্রুজল লুকিয়ে ছিল। তবে স্বার্থান্বেষী ইংরেজরা আগাগোড়া সাধারণ ভারতবাসীকে বুঝিয়েছিল এসব তাদের ভালোর জন্য। কবি দিনেশ দাস তাই ব্যঙ্গ করে বলেছেন —

"তোমার কৃপা বুঝবে কি আর মূর্খরা?
আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা
মহাপ্রভু! সবই তোমার তৈরি তা।"[২]

ইংরেজদের হাতে স্বজাতির লাঞ্ছনায় ব্যথিত কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন যে — 'তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে'।

জন্মমাত্রেই এদের কপালে মরণের চিহ্ন আঁকা হয়েছিল। এরা হলো দুর্ভিক্ষের সমসাময়িক শিশুর দল। এদের জন্ম ফুটপাতে। দুধের বদলে এদের মুখে ওঠে মায়ের শুকনো স্তন। এদের দেহ অনাবৃত। এরা পিতা-মাতার কাছে অনাদৃত। এদের 'কঁকিয়ে ওঠা কান্না' মহানগরীর ব্যস্ত বাতাসকে সম্পৃক্ত করেছিল। 'এরা হল নীড় হারানো হাজার-শত দেবতা শিশু।' কবির বিশ্বাস পঙ্কিলতার মধ্যে জন্মেও এরা জীবন কুড়িয়ে আনবে। 'মায়ার কাজল' চোখে 'কান্নাহাসির জীবনদোলায়' দুলবে। আর এখানেই কবিতাটির 'দোলনা' নামটি সার্থক হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানবতাবাদের কবি। তাঁর কবিতায় কেবল জনসাধারণের দুর্দশার কাহিনি নয়, সেই দুর্দশা নিরসনের উপায়ও বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ-আশ্রিত কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম 'গ্রাম্য' কবিতাটি। দুর্ভিক্ষ বাংলার গ্রাম্য নিরুদ্বিগ্ন জীবনে করাল ছায়া বুনেছিল। গ্রামে গ্রামে মহাজনদের হানায় সাধারণ গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই ভিক্ষার আশায় সহায়-সম্বল নিয়ে তারা

© Santiniketan Sahityapath

শহরে পাড়ি দিয়েছিল। ক্ষুধায় বা রোগাক্রান্ত হয়ে পথেই অনেকের মৃত্যু হয়। নিয়তি বা ভাগ্যকে দোষ না দিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এখানে ফায়দালোভী দেশি-বিদেশি বণিকের ঘৃণ্য মনোবৃত্তিকে দোষারোপ করেছেন। তাদের অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করে তিনি সাধারণ মানুষের হয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। কুঠার হাতে সাধারণ মানুষ যদি একত্রিত হয় তবে কবির বিশ্বাস — কুঠারের ভয়ে 'অন্নের শত্রু'রা পালানোর পথ পাবে না।

প্রথমে মিনতি। আর তাতে কাজ না হলে প্রতিবাদ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিরকুট' কবিতাটির সুর এমনি। এক গ্রাম্য প্রজা বিনীত কণ্ঠে গ্রামের জমিদারের কাছে খাজনা মকুবের আর্জি জানিয়েছে। অতি সাধারণ ভাষায় সে দুর্ভিক্ষের হতাশাজনক পরিস্থিতি বর্ণনা করে চলেছে। ক্ষুধার খাদ্য নেই, পরনের কাপড় নেই, এমনকি দারিদ্র্যের জ্বালায় গরিবের ঘটিবাটিও বিক্রি হয়ে গেছে। তবুও জমিদারের মন গলছে না। কয়েক হাজার প্রজার থেকে খাজনা আদায়ের জন্য তিনি পাইক বরকন্দাজ লেলিয়ে দিয়েছেন। এখানেই সাধারণ প্রজাটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পেটের আগুন, ক্ষেতের আগুন, সব উপেক্ষা করে এবার সে প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে চেয়েছে। খানিকটা যেন হুমকির সুরেই প্রজাটি তার জমিদারকে শোনাতে চায় —

"হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন।।"[৩]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'এই আশ্বিনে' কবিতাটির প্রথম তিনটি পঙক্তিতে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট অভাগা গ্রামবাংলা ও গ্রামবাসীর ছবি ফুটে উঠেছে। 'কঙ্কাল', 'শোকাচ্ছন্ন', 'ভগ্নদূত শাঁখা', 'রক্তচোষার ডঙ্কা', 'মৃত্যুজাল', 'অনুর্বর অন্ধকার', 'শবগন্ধ', 'চিতাভস্ম'— শব্দগুলির ব্যবহার উর্বর-সজীব গ্রামগুলির শ্মশানে পরিণত হওয়াকে ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু চতুর্থ পঙক্তিতে কবিতাটির সুর অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। নির্জীবতাকে একটানে উড়িয়ে দিয়ে প্রাণের ডঙ্কা বাজতে থাকে। জয়ের পতাকা হাতে, জীবনের মুকুট মাথায়, ফ্যাকাশে শরীরে যেন রক্তিমতার ছোঁয়া লাগে। 'আশ্বিনের আশ্চর্য সকালে' তার রেশ ছড়িয়ে পড়ে। নবজীবন অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস ক্ষণস্থায়ী। তাই কবিতাটির শেষ পঙক্তিতে আবার সজীবতার উপর মৃত্যুর ছায়া নেমে আসে। 'পরাক্রান্ত শত্রু' তার বাঘনখ বের করে 'শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে' থাবা বসায়। প্রবল বর্ষার পর আশ্বিনের রোদ যেমন সুখানুভূতি নিয়ে আসে তেমনি 'আশ্বিন' কোনো ক্ষুধার্তের সামনে হঠাৎ পাওয়া একথালা ভাতের অনুভূতি নিয়ে এসেছে। এখানেই কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা। তবে আশ্বিনের রোদও যেমন হেমন্তের বিষণ্ণতায় মুখ লুকায়, তেমনি এই ভাতের থালা ক্ষুধার্তের মুখের সামনে থেকে আচমকা অদৃশ্য হয়। ভাতের পরিবর্তে কেবল ফ্যানটুকু পড়ে থাকে।

'সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' — জীবনের এই মূলমন্ত্রটি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'সাক্ষর' কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে খাদ্যের অভাবে গ্রামের মানুষ শহরমুখো হয়েছিল। আর ভিক্ষার অভাবে সেইসব মানুষদের মৃতদেহের স্তূপে শহরের ফুটপাতগুলি ভরে উঠেছিল। সঞ্জাচ্যুত, জীবনস্পন্দনহীন, নিশ্চল মৃতদেহগুলির জন্য চোখের জল ফেলার কেউ ছিল না। সেইসব মৃতদেহের অভিশাপে ধরণী বিদীর্ণ হয়নি, বন্ধ হয়নি হত্যাকারীর হাসি। শত্রুর দালালেরা আজও বিনা বাধায় বন্ধ ঘরের ফসল মুক্ত আঙিনায় তুলে আনে। তবে কবিমন আশা করে এই বিপর্যয় একদিন থামবে। আর তখন এইসব দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা মানুষগুলির জয় অনিবার্য।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্বাগত' কবিতাটিতে দুর্ভিক্ষকালীন গ্রাম্য পরিস্থিতিকে গ্রামের গৌরবময় দিনগুলির সঙ্গে তুলনা করেছেন। গ্রামবাংলার যে চিরন্তন ছবি কবি আবাল্য-শৈশব দেখেছেন, এখন তা একেবারেই লুপ্ত। কবির ভাষায় —

"গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে —
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।"[৪]

চিত্রকল্পটির মধ্য দিয়ে এক সময়কার সজীব ও প্রাণবন্ত বাংলা যে নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ মেলে। দু'মুঠো ভাতের আশায় গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি শহরের রাস্তার ভিখিরিতে পরিণত হয়েছে। এদিকে কবি কল্পনা করেছেন রিক্ত গ্রামের ক্ষেতগুলি

সোনার ফসলে ভরে উঠেছে। কিন্তু সেগুলি কেটে গোলাভর্তি করার জন্য গ্রামে আর কেউ বেঁচে নেই। অনাহারে ও কলেরার কবলে গ্রামশূন্য হয়ে গেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ষশেষ' কবিতাটির বিষয়বস্তু 'স্বাগত' কবিতাটির মতো। কবির আক্ষেপ গ্রামের মানুষ অনাহারের জ্বালায় শহরের লঙ্গারখানার দিকে ছুটে চলেছে। কবিতাটিতে গ্রামের রিক্ততা ও শূন্যতা প্রাধান্য পেয়েছে। সঙ্গে দুর্ভিক্ষকালীন শহরের কাঠিন্য ও পেশা পরিবর্তন বর্ণিত হয়েছে — 'রাখাল এখন দূর শহরের কুলি।' এখানে পেটের তাগিদে জীবিকার পরিবর্তন হয়েছে এবং তার মানও নেমে এসেছে।

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা মহৎ। প্রত্যেকের কাছে তার জন্মভূমি প্রাণাধিক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কবি সুভাষ জানাচ্ছেন তাঁর জন্মভূমি শত্রুদের হাতে বন্দি। একদিকে ইংরেজদের শাসনভার, অন্যদিকে মনুষ্য রচিত দুর্ভিক্ষ — এই দু'য়ের জন্য বাংলার গৌরব ও ঐতিহ্য শেষ হতে চলেছে। কারণ সেই মহান ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য একজন সৎ-সক্ষম লোকও আর বাংলাতে বেঁচে নেই। অনাহার তথা রোগ মানুষকে দুর্বল ও পঙ্গু করেছে। সবলেরা ইংরেজদের হাতে বিকিয়ে গেছে। কবি তবুও আশা করেন যে স্বাধীনতার শৃঙ্খল একদিন দূরীভূত হবে। নবসূর্যের আগমনে মুক্তি আসবে। তাই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন —

"এদেশ আমার গর্ব
এ মাটি আমার কাছে সোনা
আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা।"[৫]

কমিউনিস্ট কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের বীভৎসতা নাড়া দিয়েছিল। কারণ তিনি সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতেন। তাদের যন্ত্রণা, দুঃখ, নিপীড়ন, ক্ষুধার জ্বালা দেখে ব্যথিত হতেন। তিনি তাই সাধারণ নাগরিকদের ব্যর্থতাগুলি নিজের লেখনীতে তুলে ধরেছিলেন। যেমন, 'লাল শপথের রাখি' কবিতাটিতে কবির কণ্ঠে সর্বহারাদের গান শুনতে পাওয়া যায়। তবে সেই গানে কেবল যন্ত্রণা সহ্য করার কথা নয়, বরং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে আবার আশায় বুক বাঁধার আশ্বাস পাওয়া যায়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টবক্তা। তাঁর কবিতায় অহেতুক কল্পনার স্বর্গ রচিত হয়নি। বরং কঠোর বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। তিনি দেখেছেন সাধারণ মানুষ অন্যায়ের বলি। ক্ষুধা, রোগ ও দুর্ভিক্ষে জর্জরিত। কবি সুকান্তের 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' কথাটির প্রতিবাদ শোনা যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রুটি দাও' কবিতাটিতে। দুর্ভিক্ষে ভাত অমিল। তাই জনতা বাসি, পোড়া, ভেজাল মেশানো রুটি খেয়েই তাদের জঠরজ্বালা নির্বাপণ করতে চায়। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ এতটাই অসহায় যে, নিজেকে অন্যের কাছে বিক্রি করতেও সে এতটুকু পিছপা নয়। এমনকি নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা অবধি অন্যের কাছে তুলে দিতে রাজি। কবিতাটিতে যে অতিবাস্তবতা আছে তা সাধারণ পাঠককে সচকিত করে তোলে। কল্পনার স্বর্গ থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে ফেলে। এখানেই বাস্তববাদী কবির সাফল্য।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পৈশাচিকতা বর্ণনায় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কখনো কখনো পুরাণকে হাতিয়ার করেছেন। যেমন, 'নচিকেতা' কবিতাটিতে কবি মহাভারতের উদ্দালক-পুত্র নচিকেতার যমদর্শনের আখ্যানটিকে ব্যবহার করেছেন। দুর্ভিক্ষের বাংলার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র স্থানই তুলনীয়। তা হলো নরক। নরকের মতো বাংলাতেও ক্ষুধার্ত, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মানুষের ভিড়। তাদের চিৎকারে স্বর্গের দেবতাদেরও আসন টলে যায়। কিন্তু মর্ত্যে মানুষই দেবতা। তাই বিত্তবান দেশি-বিদেশিদের বিলাস-নিমজ্জিত জীবনে সাধারণ মানুষের চিৎকার পৌঁছয় না। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, জরাগ্রস্ত মানুষের জঠর জ্বালায় বাংলার মাটিতেই নরকের দৃশ্য তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক, বিমূঢ়, স্তম্ভিত নচিকেতার মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে খুঁজে পান।

দুর্ভিক্ষের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনায় কল্পনার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। তাঁদের লেখায় গাঢ় বাস্তবতা ও স্থূলতার ছায়া পড়ে। পার্থিব ক্ষুধা আকাশের গায়ে চাঁদ-নক্ষত্রের সৌন্দর্য সমাবেশ না দেখে কেবল ভাতের গন্ধ খোঁজে। এই খোঁজ একক কোনো কবির নয়, বাংলার লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষই এই ভাতের আশায় বসে থাকে। সারাদিন-সারারাত ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে। নিদ্রা যায় না। আবার পরদিন থেকে তারা একমুঠো খুদসেদ্ধ জোগাড়ের আশায় প্রাণপাত করতে থাকে। ('আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' / 'মুখে যদি রক্ত ওঠে')

'কালো বস্তির পাঁচালী' কবিতাটির স্বাদ ভিন্ন ধরনের। এখানে এককের সমস্যা ও যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। এক দুঃখী মায়ের কাতর আহ্বান এখানে শোনা যায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, পথ্যহীন অবস্থায় সে কীভাবে তার রুগ্ন সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখবে সে কথা ভেবে

তার চিন্তার অন্ত নেই। এর ওপরে আছে শীতের মরণ কামড়। পেটে ও পিঠে কোনো কিছু দিয়েই একে মোকাবিলা করার অস্ত্র দুঃখী মায়ের কাছে নেই। মা তাই প্রকৃতির উষ্ণতাকে, অর্থাৎ প্রখর সূর্যের আলো ও তাপকে আহ্বান জানায় যাতে রোদের পরশটুকু পেয়ে অন্তত তাঁর অবসন্ন, ক্লান্ত সন্তানগুলির জড়তা কেটে যায়। তবে রোদের আলো থাকলেও বস্তির অন্ধকার-স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে সেই আলো পৌঁছায় না। শীতকে এখানে 'ডাইনি বুড়ি'র সঙ্গো তুলনা করা হয়েছে। স্নেহময়ী মা চাইছেন 'কড়া রোদ্দুর' এসে শীতবুড়িকে চুল ধরে তাড়িয়ে দিক। উষ্ণতার পাশাপাশি বস্তিবাসী এই দুঃখী মা অন্নের দেবতার কাছেও প্রার্থনা জানায়। নিজের সন্তানদের জন্য মা দুধভাত নয়, সামান্য নুনভাত হলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু শত প্রার্থনা, ভিক্ষা চাওয়া সত্ত্বেও সন্তানদের মুখে ক্ষুধার সেই খাদ্য তুলে দিতেও তিনি অপারগ। তাই নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে তিনি বলেন —

> "বাছা রে, আমরা অচ্ছুৎ, তাই যেভাবে যতই ডাকো
> কোনো দেবতাই বস্তিতে আসে নাকো।"[৬]

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ মধ্যবিত্তদের রাস্তার ভিক্ষুকে পরিণত করেছিল। আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিম্নবিত্ত মানুষজন। তাদের নিজস্ব জমানো অর্থ বলে কিছু ছিল না। এমনকি ভিক্ষা চাওয়ার পথটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই না খেতে পেয়ে তারাই আগে মারা যায়। 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' কাব্যগ্রন্থের 'কালো বস্তির পাঁচালী' কবিতাটিতে এমনি একজন মায়ের কাতর প্রার্থনার চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রাচীন ভারতে গৌতম বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের জন্য স্বেচ্ছায় উপবাসে ছিলেন। আর আধুনিক ভারতে শাসকদলের চক্রান্তে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। এই দুই ধারণার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মহাদেবের দুয়ার' (১৩৭৪) কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তু রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে মোট ৩৭টি কবিতার বেশিরভাগেই তিনি মহানগরীর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতাগুলির আলাদা কোনো নাম নেই, তবে ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। চতুর্থ কবিতাটিতে মানবিকতার ক্রমাবনতির চিত্র ফুটে উঠেছে। গৌতম বুদ্ধের উপবাস ভঙ্গা করতে সুজাতা পায়েস নিয়ে এসেছিলেন। আর বর্তমানে মানুষ তার নিজের লোভ ও লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপবাসে থাকতে বাধ্য করেছে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা বা ভাষা প্রয়োগ ছাড়াই তাঁর কাব্যে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষেও তা বোধগম্য হয়েছে। মৃত উলঙ্গা শিশু, একটি পচা ফলের অধিকার নিয়ে মানুষে মানুষে মারামারি সবই তাঁর বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তু। আবার 'তেরো নদীর জল' কাব্যে বীরেন্দ্রবাবু দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষের সময় চঞ্চলা দেবী লক্ষ্মী কৃষকের ধানের গোলা ছেড়ে ধনীর লোহার সিন্দুকে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই সাধারণ মানুষের খাদ্যের প্রার্থনা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। খাদ্যের জন্য সাধারণ মানুষের চিৎকার আর ধনবান বৃত্তের নির্লজ্জ প্রদর্শন 'ভিক্ষার মিছিল যায়' কবিতাটিতে এই দু'য়ের তুলনা তিনি দেখিয়েছেন।

সময়ের সঙ্গো কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরো পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। ১৩৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'শীতের ভিক্ষুক' কবিতাটি দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তথা বাস্তব বর্ণনায় আরো ধারালো সংযোজন। 'বেঁচে থাকার কবিতা' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতায় কবি মানুষের তৈরি শহর কলকাতায় লোভী মানুষদের বিকৃত লোভের পরিণতিকে দেখিয়েছেন। শীতের রাত্রে এক ভিক্ষুক উলঙ্গা শরীরে শহরের রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তার কোনো আশা নেই, নেই চাহিদা। কারো বিরুদ্ধে অভাব-অভিযোগও নেই, আছে কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষা।

'রাজা আসে যায়' কবিতায় কবির বক্তব্য হলো সমাজের উঁচু স্তরের মানুষদের আনাগোনা অবিরাম চলতে থাকে। একদল আসে, আর একদল যায়। কিন্তু সমাজব্যবস্থার কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয় না। কারণ 'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।' ধনী ক্রমশ ধনী হতে থাকে; দরিদ্রকে হতে হয় আরো দরিদ্র। কেননা উঁচুস্তরের মানুষ কেবল প্রতিশ্রুতি দেয়, কোনো প্রতিকার করে না। এ প্রসঙ্গো তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছোটোগল্পের মেহের আলীর প্রলাপের প্রসঙ্গা এনেছেনম — 'সব ঝুট হ্যায়'। সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস, ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি সবই মিথ্যা। আসল হলো বেঁচে থাকা। তা যেভাবেই হোক না কেন — খুন করে অন্যের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে অথবা কুকুরের সঙ্গো লড়াই করেই হোক।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর কাব্যের প্রতিটি লাইনে বামপন্থী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের কথা, ভাঙা-গড়া, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ঘিরেই তাঁর কবিমন আবর্তিত। কবি সুকান্তের বিখ্যাত'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের মতো বিপর্যয়ের সাক্ষী।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাহিত্যিক জীবনের প্রথমার্ধে তাঁর মধ্যে অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তনক্ষমতা, প্রকাশভঙ্গিমা, শব্দচয়ন — সবই তাঁর অনুজদের অনুকরণযোগ্য। তরুণ কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ। বিশ্বকবির সৃষ্ট কাব্যজগতে অবগাহনকালে বাস্তবের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে পদার্পণ করে তরুণ কবি যখনই কাব্য রচনায় রত হন, তখনই এর রুক্ষতা, ভগ্নতা ও বেদনা তাঁকে উদ্বেলিত করে তোলে। 'তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলে, গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারি মৃত্যুর কবলে' — পঙক্তিগুলি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের বিভীষিকায় দিনগুলির ইঙ্গিত দেয়। চারিদিকের পরিস্থিতি দেখে কবি বুঝতে পারেন উপবাস নিশ্চিত। তাই কবিও নিজেকে 'দুর্ভিক্ষের কবি' হিসেবে পরিচয় করান। 'চন্দ্রালোকে অবলোকন' করে নয়, কবির বসন্ত রাতগুলি অতিক্রান্ত হয় 'খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়' আর সাইরেনের তীব্র শব্দে প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষতবিক্ষত হয়। কবিও আর শান্তির বাণী শোনাতে চান না; বরং সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শেষ পর্যন্ত সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি হয়ে ওঠে বিপ্লবী চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের মাটিতে যে কোনোদিন অন্নসংকট দেখা দিতে পারে, তা যেন কল্পনার অতীত। এই দোলাচলের মধ্য দিয়ে তাঁর 'বিবৃতি' কবিতাটি শুরু হয় — 'আমার সোনার দেশে অবশেষে দুর্ভিক্ষ নামে।' দলে দলে লোকজন নিজের শেষ সম্বল নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ফুটপাতগুলি দখল করে। ভিক্ষার উপায় না থাকায় শহরের সামনে এসে প্রাণপাত করতে থাকে। অন্নের খোঁজে মানুষ তার সমস্ত মানবিকতা হারিয়ে পশুর মতো হয়ে ওঠে। তবে কবিতাটির চতুর্থ স্তবকে এসে কবি সাধারণ মানুষকে আবার নবজীবনের আশ্বাসবাণী শোনান। সেই আশ্বাসে মজুর, কৃষক-সহ সাধারণ মানুষেরা জেগে ওঠে। তাদের প্রতিবাদের ছটায় আবার 'ফুটন্ত সকাল' আসে।

পরাধীন ভারতে ইংরেজ শাসকদের হাতে বঞ্চনা নিপীড়ন ও শোষণ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে শিখেছিল। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে তুচ্ছ করে দেশ ও দশের জন্য সে ভাবতে শিখেছিল। কিন্তু পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ আবার সাধারণ মানুষকে স্বার্থপর করে তুলেছিল। কেননা পেটের অন্ন ও পরনের বস্ত্র না থাকলে মানুষ অন্য কোনো ভাবনাতে নিমগ্ন হতে পারে না, জঠরাগ্নির জ্বালাতেই অহোরাত্র জ্বলতে থাকে। তাই ইংরেজ শাসকেরা ভারতবাসীকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জৈবিক (ক্ষুধা-জৈবিক প্রবৃত্তি) সবদিক থেকেই মাত দেবার চেষ্টা করেছিল এবং তাতে সফলও হয়েছিল। তরুণ কবি সুকান্ত তাই 'ঐতিহাসিক' কবিতায় আক্ষেপের সুরে বলেছেন —

> "কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
> তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটি দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।"[৭]

বাংলার জনসাধারণ ক্ষুধার চাল জোগাড়ের জন্য কন্ট্রোলের দোকানের সামনে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু এই সমবেত প্রচেষ্টা তারা দেশের স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে দেখাতে পারেনি। পোল্যান্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইত্যাদি দেশের স্বাধীন হওয়ার ইতিহাস নিয়ে সুকান্ত বলেছেন ভারতের জনগণকেও এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। বিদেশি শাসকদের হাত থেকে নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার যে আহ্বান তরুণ কবি তাঁর 'ঐতিহাসিক' কবিতাটিতে দিয়েছিলেন, সেই একই অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় তাঁর 'শত্রু এক' কবিতায়। এক সাধারণ মজুরের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর চড়া হয়ে ওঠে। কবিতাটিতে আছে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা। অন্নহীন এবং প্রতিনিয়ত মৃত্যুর উপস্থিতি —

> "এদেশ বিপন্ন আজ; জানি আজ নিরন্ন জীবন—
> মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
> রক্তের আল্পনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর;"[৮]

'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের 'বোধন' কবিতাটি তিনি একজন 'মহামানব'কে উৎসর্গ করেছেন। তবে কবি এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই মহামানব মনীষী বা একক কোনো ব্যক্তি নন। এ হলো বাংলার আপামর জনগণ। যারা ক্ষুদ্র হয়েও নিজস্বগুণে অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। এইসব জনগণের উদ্দেশ্যে কবি বারংবার বলেছেন বিদেশি শাসক ও স্বদেশি শোষক, যারা তেরোশো পঞ্চাশের ভয়াবহ অন্নকষ্টের কারণ তাদের কোনো ঔদাসীন্য বা ক্ষমা প্রদর্শন করা চলবে না। কারণ তাদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। মারি, মড়ক, দুর্ভিক্ষ — এই তিনের আঘাতে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় কোনো আপোষ-আলোচনা নয়, সরাসরি সংগ্রাম চাই। নিজেকে ও নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য তাই কবির কণ্ঠে গর্জে ওঠে প্রতিবাদ —

> "আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই

© Santiniketan Sahityapath

স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।”[৭]

তেরোশো একান্ন সনের মাঠ ভর্তি ফসলের সামনে দাঁড়িয়ে এক কৃষক আর্তস্বরে বলে উঠেছে — ‘কাস্তে দাও আমার এ হাতে’। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রায় সমস্ত তেরোশো পঞ্চাশেই বাংলার মানুষ উপবাস করেছে। চাষির পরিশ্রমের ফসল মহাজনদের আড়তে কুক্ষিগত হয়েছে। পেটের জ্বালা নিবারণ করতে কৃষকটি তার অতি প্রিয় কাস্তেটাও বেচে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই মাঠভর্তি পাকা ফসল কাটার সময় সে করুণ স্বরে নিরুপায় ভিক্ষা প্রার্থনা করেছে — ‘আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে।’ সুকান্ত এই ‘কাস্তে’ শব্দটিকে দ্ব্যর্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। একদিকে এটি ফসল কাটার যন্ত্র। কিন্তু অন্যদিকে এই নিরীহ কাস্তেটিই আবার বিপজ্জনক হাতিয়ার হয়ে ওঠে যখন কৃষক দেখে নিজের যত্নে লালিত ফসলের দিকে ‘অন্নের শত্রু’ তার আগ্রাসী হাত বাড়িয়েছে।

‘স্বাগত’ কবিতাটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কল্পনা করেছেন গ্রামের ক্ষেতগুলি পাকা ফসলে ভরে উঠেছে। অথচ সেই ফসলগুলি কেটে গোলাভর্তি করার মতো কেউ আর গ্রামে নেই। সুকান্তের ‘এই নবান্নে’ কবিতাটিতেও এই একই সুর শোনা যায়। দুর্ভিক্ষ আর মারিতে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ‘গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন, / পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন’ —এই পঙক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে স্বজন হারানো কৃষকের বেদনাকে তুলে ধরা হয়েছে। তাই পাকা ফসলে মাঠভর্তি হওয়ার পরেও আনমনা কৃষক কাস্তে হাতে বিগত দিনগুলির কথা ভাবছে। যারা নিজেদেরকে নিংড়ে মাঠভর্তি ফসল ফলিয়েছে, তারা কেউই আজ আর উপস্থিত নেই। হেমন্তের নবান্নের উৎসবে কবি তাদের আহ্বান বা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বাস্তবের রুক্ষতা ও পরাজয় বারংবার কল্পনার জগত থেকে আছড়ে ফেললেও কোনো কবিমনই আশ্বাসের লোভ ছাড়তে পারেন না। তরুণ কবি সুকান্তও তার ব্যতিক্রম নন। সাধারণ মানুষের কষ্ট, মৃত্যু, সবকিছুতে তিনি ব্যথিত হলেও এটুকু আশা করতে ভোলেন না যে আবার সব কিছু নতুনভাবে শুরু হবে। এই নির্যাসটুকু তার ‘কৃষকের গান’ কবিতার মূলকথা। যেখানে কৃষক প্রতিজ্ঞা করে ‘এ বন্ধ্যামাটির বুক চিরে এইবার ফলাব ফসল’। কারণ তারা ‘দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর’ দেখেছে। কৃষকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কবিও নবজীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা ও বাঙালির আর্তনাদ বামপন্থী কবি বিষ্ণু দে-র মনে আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য ও সামাজিক চিন্তাধারার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে দুর্ভিক্ষের সমসাময়িককালে রচিত তাঁর তিনটি কাব্যে —‘এক পৌষের শীত’, ‘চতুর্দশপদী’ এবং ‘১৯৪৩: অকালবর্ষা’। ‘সাত ভাই চম্পা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিষ্ণু দে-র ‘এক পৌষের শীত’ কবিতাটি দীর্ঘ দশটি স্তবকে বিভক্ত। এর প্রথম দুটি স্তবকে কবি শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের উর্বরতা ও সজীবতার স্তুতি করেছেন। সাধারণ কৃষকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় অথচ সেই ফসলে তাদের কোনো অধিকার নেই। কবিতাটির তৃতীয়-চতুর্থ স্তবকে ব্যস্ত শহর কলকাতা এবং লঙ্গারখানার ভিড়ের বর্ণনা রয়েছে। গ্রামের কৃষকই শহরে এসে অন্নহীন ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। বিষ্ণু দে শহুরে আধুনিকতার তীব্র তিরস্কার করেছেন এইভাবে যে, সভ্য মানুষ আরো সভ্য হতে গিয়ে, অমৃত পেতে গিয়ে পৃথিবী মন্থন করে গরল তুলে আনছে। অথচ সেই গরলের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই।

বাংলার মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই মড়ক, মহামারি, দুর্ভিক্ষ নিয়ে জীবনের পথ চলেছে। অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেও সে নিজের দু’হাতের কর্মশক্তির উপর ভরসা হারায়নি। তাই দেশের দুর্দিনে কবির বিশ্বাস কেবল এখানকার মানুষই পারে বাংলার মাটির সজীবতা ফিরিয়ে আনতে। ‘চতুর্দশপদী’ কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনি এবং একটি বড়ো প্রশ্ন উঠে এসেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে যে-কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার মূল হোতা হলো সমাজের গণ্যমান্য, উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা। তাঁরা ঠাণ্ডা ঘরে বসে ক্ষুরধার মস্তিষ্কচালনার মাধ্যমে দেশে-বিদেশের আরো কোটি কোটি লোকের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। অথচ কবি দেখিয়েছেন তাঁরাই যে-কোনো ঝড়-ঝাপটায় সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হন, আর সাধারণ মানুষই নিজেদের বলিদান করে।

© Santiniketan Sahityapath

কমিউনিস্ট কবি অতি স্পষ্টভাবে সমাজের দুই তলার মানুষের ব্যবধান দেখিয়েছেন। ইংরেজদের সঙ্গে জাপানিদের যুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ ফল হলো বাংলায় পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। কেবল বঙ্গবাসীই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। কারণ ইংরেজ শাসকগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোটি কোটি ভারতীয়দের অভুক্ত অবস্থায় মারতে বাধ্য করেছিল। কবি কিছুটা ব্যঙ্গের সুরেই বলেছেন, "উপরের দেনা তলায় মেটায়"। সাধারণ মানুষকে এই দেনা মেটাতে গিয়ে নিজের কাস্তে, হাতুড়ি, হাল, জাল, দড়ি, মাকু সব বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। বিনিময়ে তাদের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠেছে। কবিতাটির শেষ ভাগে এসে কবির গলাতেও আশার সুর শোনা যায়। কবি বিশ্বাস করেন কালের চাকা একদিন ঠিক ঘুরবে এবং সেই সুদিনে শ্রেণিবৈষম্য দূর হয়ে সাম্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

'১৯৪৩: অকালবর্ষা' কবিতাটি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ তাজাপ্রাণ অকালে চলে গিয়েছিল তাদের প্রতি সহানুভূতি জানায়। সাধারণত বর্ষাকাল কবিদের মনে কাব্যের সুখানুভূতি নিয়ে আসে। বর্ষার সিক্ত মেঘমালাকে দেখে অভিভূত কালিদাস 'মেঘদূত' কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিককালে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের বর্ষা কাব্যচেতনা নয়, সাধারণ মানুষের যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি পাকা ফসল নষ্ট করেছিল, বাড়িয়ে দিয়েছিল বুভুক্ষুর সংখ্যা এবং প্রকারান্তরে না খেতে পেয়ে মৃত মানুষের সংখ্যাও। কবিতাটিতে বর্ষার ক্ষতিকর দিকগুলিই উন্মোচিত হয়েছিল। বর্ষার জল মাথায় নিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ চালের আশায় কন্ট্রোলের দোকানে লাইন দিয়েছিল, আবার সেই বৃষ্টিতে ভিজেই জরাগ্রস্ত অথচ ওষুধহীন মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। ১৯৪২ সালের ধানের অজন্মার পর যে বর্ষা হতে পারত প্রকৃতির আশীর্বাদ। রূপ বদলে সেই বর্ষাই হয়ে ওঠে অভিশাপ।

কবিতাটির নামে বর্ষার অনুষঙ্গ থাকলেও শেষের দিকে এসে কবি সুর বদলেছেন। মানুষের দুর্গতির জন্য তিনি প্রকৃতিকে নয়, বরং মানুষের ষড়যন্ত্রকেই দায়ী করেছেন। কেননা বিশ্বের ইতিহাসে প্রকৃতিসৃষ্ট আকালকে মানুষ তার নিজের উদ্যমে জয়ী করেছে, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট আকালকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক প্রাণ চলে গেছে। এক্ষেত্রে কবিতাটির '১৯৪৩: অকালবর্ষা' নাম যথাযথ নয়। কবিতাটির কয়েকটি শব্দ বদলে তেরোশো পঞ্চাশ সালের ৬ শ্রাবণ 'অরণি' পত্রিকাতে 'চালের কাতারে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই নামটি আমার যথার্থ বলে মনে হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ যুগসচেতন কবি। তিনি সমকালীন প্রবাহ থেকে মুখ ফেরাতে পারেন নি। তাঁর কাব্যে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত এবং স্বতন্ত্র ধারার মিলন দেখতে পাওয়া যায়। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থটি কবির যুগসচেতনতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উত্তাল ভারত তথা বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চের একের পর এক পালাবদল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার দুর্ভিক্ষ ভারতের জাতীয় আন্দোলন — সবই জীবনানন্দের সমসাময়িক চিন্তাধারায় স্থান পেয়েছিল।

'চারদিকে ভাঙনের শব্দ' দিয়ে 'কার্তিকের ভোর-১৩৫০' কবিতাটি শুরু হয়। ভাঙন ধরেছে দেশে, ভাঙন ধরেছে সমাজে, ভাঙন ধরেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক বন্ধনেও। এই ভাঙনের শব্দ কবিকে অস্থির করে তুলেছে, কারণ কবি জানেন যতদিন যাবে এই ভাঙন তত বাড়বে। সর্বগ্রাসী হয়ে তা সকলকে ধ্বংস করবে। তবু কবিমন নৈরাশ্যবাদী হতে পারেন না। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের কার্তিকের ভোরে নবোদিত সূর্যের ঘটায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। তবে এই আলোকচ্ছটা সোনালি ফসলের উপর পড়ে কৃষকের ভরসা বাড়াচ্ছে না। সকাল হচ্ছে, তবে তা নব আশা নিয়ে নয়, আরো একটি সংগ্রামের দিন নিয়ে। ফুটপাতে মৃত্যু, লঙ্গারখানার ভিড়, শ্মশানের হরিবোল — সব মিলিয়ে আরো একটি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করার দিন।

বিংশ শতাব্দী আধুনিকতা এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই আধুনিকতা ছিল ধ্বংসেরই নামান্তর। এই শতাব্দীতে মানুষ প্রকৃতির ইচ্ছেতে জন্মায় বটে, কিন্তু অন্য মানুষের ইচ্ছেতে তার মৃত্যু হয়। তাই 'অগণন সাধারণ'এর মৃতদেহের স্তূপের পাশে বসে কবি শোকগাথা রচনা করেন — 'এই শতাব্দী-সন্ধিতে মৃত্যু'।

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ চিরদুঃখী। জমিদার-জোতদারের অন্যায়ের বলি। তবু তেমন দিনেও আমাদের প্রপিতামহদের মুখে দু'মুঠো নুনভাতের অভাব কখনো হয়নি। কিন্তু তাঁদের সন্তানেরা আজ 'দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতার' পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় বেঁচে আছে। তাঁর 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় এই আক্ষেপ কবির গলায় শোনা যায়। জীবনানন্দের 'দীপ্তি', '১৯৪৬-৪৭', 'হে হৃদয়', 'পৃথিবীর রৌদ্রে', 'ক্ষেতে প্রান্তরে', 'বিভিন্ন কোরাস' ইত্যাদি কবিতায় আকালের দুর্গতির ছবি ফুটে উঠেছে।

© Santiniketan Sahityapath

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার প্রভাবে বাংলাতে দেখা দেওয়া পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ কবি অমিয় চক্রবর্তীকে আন্দোলিত করেছিল। তাঁর 'অন্ন দাও' কবিতাটি কেবল অন্নহীন ভিক্ষুকের প্রার্থনা নয়, প্রচ্ছন্ন হুমকি কিংবা দাবির সুরও তাতে ধরা পড়ে। কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে অন্নহীনের অন্নের প্রতি অধিকার গর্জে ওঠে। বাংলার অন্নে প্রতিটি বাঙালির সমানাধিকার। তাই সাধারণ মানুষ ভিক্ষা নয়, অন্নের জন্য দাবি জানায় —

"অন্ন দাও, অন্ন দাও....
মূর্ছা চোখের অন্ন দাও,
বোবা বুক বলে, অন্ন দাও।"[১০]

কারণ সাধারণ মানুষ জানে 'অন্ন আছে'। তাদের বঞ্চিত করে তাদেরই পরিশ্রমের ফসল কোনো লোভের মরাই বা ধ্বংসগোলায় সঞ্চিত আছে। তাই কাকুতি-মিনতি নয়, ন্যায্য অধিকারের দাবিতে তারা গর্জে ওঠে—

"অন্ন আছে...
অন্ন দাও —
প্রাণের ক্ষুধায় একটু অন্ন দাও।।"[১১]

১৩৫০ বিপর্যয়ের কাল। ক্ষুধা, বঞ্চনা, অত্যাচার, শাসন ও মৃত্যুর কাল। কবির '১৩৫০' কবিতাটিতেও তাই এই সময়ের রিক্ততার ছবি ফুটে উঠেছে। শহরের ফুটপাতে ধূলিধূসরিত এক মৃতপ্রায় শরীর, বাঁচার আশা নেই জেনেও তার হাতের মুঠোয় একটি আধুলি ধরা ছিল। কিন্তু প্রাণত্যাগের পূর্বেই তার মুঠো আলগা হয়ে আধুলিটি মাটিতে পড়ে যায়। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে-বউটির সব আশা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেমন ভাদ্র মাসের রোদ। মৃত্যু আসে না, অন্নও না। এরকম শত শত মৃতদেহকে পাশ কাটিয়ে সভ্যতা দৌড়োতে থাকে।

সমাজ ও মনুষ্যত্বের রিক্ততায় কবিমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। স্বজাতির কলঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে কবি অদ্ভুতভাবে তাঁর মনের ক্ষতগুলি ব্যক্ত করেছেন —

"হায়রে, নেমন্তন্ন।
সাগরপারের লোক, দেখে যাও
অন্য দেশের শিশু..."[১২]

ইংরেজদের সঙ্গে জাপানিদের যুদ্ধে ভারতবাসী যেন উলুখাগড়ায় পরিণত হয়েছিল। দুই বিবদমান দেশের জন্য ভারতের কোটি কোটি নারী-পুরুষ-শিশুকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। কবি এখানে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরেই বিদেশিদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তারা যেন স্বচক্ষে এদেশের লোকের অবস্থা দেখে যায়। এদেশের লোক পথের উপর সারি সারি কাঙালের মতো বসে থাকে, অন্নের প্রকৃত দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্নাভাবে মৃত্যুবরণ করে। আর এদের সামনে দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে বা উঁচু বাড়ি থেকে যারা এইসব ফুটপাতবাসীদের মরতে দেখে উদাসীনভাবে নিজেদের সম্পত্তি বাড়াতে থাকে।

'নিমন্ত্রণ' কবিতার মূলভাব অমিয় চক্রবর্তীর অপর কবিতা 'অন্নদাতা'তেও ধরা পড়েছে। গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষিই মহানগরীর লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের প্রাণদাতা। কারণ তারাই কঠোর পরিশ্রম করে মাটিতে ফসল ফলায়। সেই ফসলেই শহর কলকাতার জীবনযাত্রা লালিত-পালিত হয়। তবে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় এই চিত্রের পরিবর্তন ঘটে। গ্রামের অন্নহীন কৃষকেরা ভিক্ষার আশায় শহরের ফুটপাতে এসে জমা হয়। কিন্তু 'পাথরে মোড়ানো' শহরবাসী তাদের দুঃখে সমব্যথী হয় না। বরং অনাদর-নিষ্ঠুরতায় আরো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এইসব দরিদ্র, গ্রাম্য কৃষকদের ও মানুষজনের দুঃখে কবিও সমানভাবে ব্যথিত। তিনি এদের পুনরায় গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষিকাজ শুরু করার উপদেশ দেন।

আধুনিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যচর্চা বিংশ শতাব্দীর আশীর্বাদ ও অভিশাপগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। একদিকে তিনি তাঁর নিজসৃষ্ট জগতে বুঁদ। আবার অন্যদিকে নতুনত্ব সম্পর্কে সংশয়ী। কবি মানবদরদী। তাই চলমান সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলিকে তিনি যেমন সমালোচনা করতে ছাড়েননি, আবার কখনো কখনো নিজের সিদ্ধান্তের নিজেই সহমত পোষণ করতে পারেন নি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ'তে (Blank Verse) লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফেরারী ফৌজ' কাব্যগ্রন্থের 'ফ্যান' কবিতাটি মূল বিষয় হলো পঞ্চাশের দিনগুলিতে কলকাতার পথেঘাটে ভাত নয়, সামান্য ফ্যানের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছিল। ভাতের মাড়টুকু পাওয়ার জন্য লক্ষমানুষ বুভুক্ষুর মতো গৃহস্থবাড়ির সামনে হত্যে দিয়ে বসে থাকত। কেবল মানুষের চামড়াটুকু গায়ে জড়ানো একদল বোধহীন জীব, জড় পদার্থ। কবিতাটিতে আছে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার চরম অবনতি। তারা এতোটাই ক্ষুধার্ত যে তাদের মানবিক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের মধ্যে যে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছিল এখানে তার প্রমাণ মেলে। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'অন্নদাতা' কবিতাটির সুর যেন এখানেও লেগে থাকে। এই আপাত নিষ্ক্রিয় মানবদেহগুলিই অন্নের প্রকৃত উৎপাদক। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এই কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগে এসে সুর বদলান। তিনি আধুনিকতাকে যেন স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, এঁরাই হলো সভ্যতার প্রকৃত স্তম্ভ। কৃষকের চাষ করা ফসলেই মহানগরীর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। কবির ভাষায় ―

"একদিন এরা বুঝি চষেছিল মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল
ভুলে গেছে লাঙ্গালের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়।"[১৩]

কবি মহানগরীর গৃহস্থ বাড়িগুলি থেকে গরিবদের ফ্যান বিতরণ দেখেছেন। তবে তাঁর আশঙ্কা গরিবদের কপালে এই ফ্যানটুকুও আর বেশিদিন জুটবে না। কারণ সেই ফ্যান পচিয়ে দেশি মদ প্রস্তুত হবে, যা পরোক্ষে ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ বাড়াবে। শহরের মৃত বুভুক্ষু শিশুদের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে কবি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মানবিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। সাধারণের প্রতি মমতা এবং শাসক দলের প্রতি প্রশ্ন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'জনৈক', 'রাত জাগা ছড়া' ইত্যাদি কবিতাগুলিতেও ফিরে আসে।

দুর্ভিক্ষের সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন, সর্বোপরি বিদেশি শাসকদের হাতে ভারতীয়দের লাঞ্ছনা, কবিকে ব্যথিত করেছিল। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের মৃতদেহের স্তূপের উপর সভ্যতার যে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কবি তা মেনে নিতে পারেন নি যদিও তাঁর কাব্যগুলিতে বলিষ্ঠতার অভাব দেখা যায়। তিনি চারপাশে যা দেখেছেন, তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রতিবাদ করেন নি।

'শ্রাবণ' কবিতায় কবি বর্ষণমুখর এই ঋতুটির কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন এই বলে যে, ১৩৫০এর শ্রাবণে তিনি ঋতুর যথার্থ অভ্যর্থনা করতে পারলেন না। বর্ষা কাব্যপ্রেমীদের সময়। বর্ষার সজলতার মধ্যেই কবিরা নিজেদের চিন্তার শুদ্ধরূপটি দেখতে পান। বুদ্ধদেব বসুও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু এই বিশেষ বছরটিতে চারিদিকের পরিবেশ বদলে গেছে। তাই নিছক কাব্যনিসর্গের রোমান্টিকতা নিয়ে চর্চা করতে নয়, কবি চেয়েছেন সাধারণ মানুষের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান করতে শ্রাবণের ধারা যেন অমৃতবারি সিঞ্চন করে।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে 'বুভুক্ষার করাল রাক্ষস' উপমার মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ প্রভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিপর্যয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে কবি সময়কে প্রশ্ন করেন। তার জিজ্ঞাস্য কালের প্রলেপ কি এই ক্ষতে আরাম দেবে? আগামী দিনে দাঁড়িয়ে কেউ কি এই মৃত্যুগুলির কথা মনে রাখবে? এই অনাচার, স্বার্থপরতা সবই কি কালের গর্ভে বিস্তৃত হবে? ('হে কাল') দুর্ভিক্ষের অন্যান্য কবিরা যখন দুর্নীতি দেখে প্রতিবাদে মুখর হচ্ছেন, লেখনীর মাধ্যমে শাসকদলকে ব্যঙ্গ এবং জনতাকে সমবেতভাবে লড়াইতে উৎসাহী করছেন, তখন বুদ্ধদেব বসু ভবিষ্যতের গর্ভে নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজছেন। তাঁর বক্তব্য, কালের প্রবাহে জীবনের সব ক্ষত জুড়িয়ে যাবে। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে Escapist বা পলায়নপর বলা চলে।

মার্কসবাদী কবি অরুণ মিত্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণির অত্যাচার, শোষণ এবং প্রলেতারিয়েতের জীবনযন্ত্রণার ছবি তুলে ধরেছেন। কবি তাঁর দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক কয়েকটি কাব্যের 'মরযাত্রা', 'এবার', 'জঠর' কবিতাগুলিতে বাংলাতে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের বলি অসহায় যে সমস্ত নারী-পুরুষ তাদের প্রতি সমবেদনার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'একটি নিবেদন', 'রাস্তা বোঝাই তোমরা', 'বর্ষমান' কবিতাগুলিতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের আভাস মেলে। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত অরুণ মিত্রের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'জঠর' কবিতাটিতে নিরন্ন ভিক্ষুকদের জীবন-যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। জঠর জ্বালায় পুড়ে এইসব অন্নহীনের দল নতুন শপথ নিয়েছে এবং খাদ্য ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে। যারা তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে তাদের কাছ থেকে নিজেদের মুখের অন্ন ছিনিয়ে আনবে ― এই তাদের লক্ষ্য।

'প্রান্তরেখা' কাব্যগ্রন্থের 'একটি নিবেদন' কবিতায় কবি বাজার থেকে উধাও অন্নবস্ত্র এবং কালোবাজারির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। কবি ইংরেজদের প্রতি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে —

"... এবার কপালে
চমৎকার ভাগ্যলিপি লিখেছে সরকার:
অন্নবস্ত্র নিরুদ্দিষ্ট, হয়তো গ্রেপ্তার।"[১৪]

'রাস্তা বোঝাই তোমরা' কবিতায় কলকাতার ফুটপাত জুড়ে মৃত এবং মৃতপ্রায় মানুষদের প্রসঙ্গ এসেছে। এইসব নিষ্প্রাণ শরীরগুলি শীর্ণ, জীর্ণ। এদের জন্য হাসপাতালের বেডে কোনো স্থান নেই। রাস্তার ফুটপাতগুলি এদের ভিড়ে ভরে উঠেছে — "দামি কঙ্কালে পথ বাঁধালাম জনসঙ্গীর অবিনশ্বর এই মূল্যের পরিশোধ চাই।"[১৫] 'এবার' কবিতাটিতে শীর্ণ 'কঙ্কালমুঠি' নিজেদের অন্নের দাবি প্রকট করে। 'করুণ আশ্রয়প্রার্থীরা'ও ভেজা পাঁচিলের নিচে আশ্রয় খোঁজে।

দুর্ভিক্ষকেন্দ্রিক এইসব কবি ছাড়াও কেউ প্রত্যক্ষভাবে আবার কেউ পরোক্ষভাবে দুর্ভিক্ষের জন্য কলম ধরেছেন। কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'আমাদের গান' কবিতায় অন্নহীন, গৃহহীনদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বর্ণনা করেছেন। গ্রাম্য নিরক্ষর লোক দু'মুঠো ভাতের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তবে তার ভাগ্যে জোটে ফ্যান বা বাজরার খিচুড়ি।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য জীবনে এমন একটি বাঁক, যা কাব্যচিন্তাকে নতুন পথে প্রবাহিত করেছিল। স্বচ্ছ প্রকৃতিপ্রেম কিংবা সৌন্দর্যের পূজা নয়, বাঙালি কবিগণ পথের ধুলো-মাটি-কাদার সংস্পর্শে এসে সাধারণ জীবনকাহিনি তুলে ধরেছিলেন। ক্লেদ, অনাহার, মৃত্যু, শ্মশান, কঙ্কাল ইত্যাদির আবর্তে বিপর্যস্ত বাংলার জনজীবনের অন্যতম দলিল সমসাময়িক কবিতাগুলি।

তথ্যসূত্র:

১। 'দিনেশ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দিনেশ দাশ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ, জুন ২০১৪, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৩৯
২। ওই, পৃ. ৪১
৩। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০২২, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৪১
৪। 'আকাল', সুকান্ত ভট্টাচার্য (সম্পাদক), সারস্বত লাইব্রেরি, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৬, পৃ. ৩৩
৫। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০২২, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৪৫
৬। ওই, পৃ. ৫৯
৭। 'সুকান্ত সমগ্র', সুকান্ত ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, মার্চ ২০২২, ১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৩৩
৮। 'সুকান্ত সমগ্র', পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, পত্র ভারতী, সপ্তম মুদ্রণ মার্চ ২০১৫, ৩/১ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা, পৃ. ৬৯
৯। ওই, পৃ. ৪০
১০। 'কবিতা সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড), অমিয় চক্রবর্তী, চতুর্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৬, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২১২
১১। ওই, পৃ. ২১২
১২। ওই, পৃ. ২১৫
১৩। ওই, পৃ. ৪
১৪। 'অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা', অরুণ মিত্র, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০২২, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ১৭
১৫। 'সুকান্ত সমগ্র', সুকান্ত ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, মার্চ ২০২২, ১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ২৭১

—